মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি

১	M	২	N	৩	L	৪	K	৫	N	৬	K	৭	L	৮	N	৯	L	১০	K	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	L	১৫	L
১৬	N	১৭	M	১৮	L	১৯	L	২০	L	২১	K	২২	L	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	M	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু।

খ কবরের জীবনকে বারযাখ বলা হয়। এর স্থায়িত্ব হবে মৃত্যুর পরবর্তী সময় থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, 'তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।'

(সূরা আল-মুমিনূন : আয়াত-১০০)

গ উদ্দীপকে বাদলের বক্তব্যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান তথা তাওহিদের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শই তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত তাওহিদই হলো ইমানের মূল।

উদ্দীপকে বাদল টেলিভিশনে তিমি মাছ দেখে আল্লাহ তায়ালার যে গুণের কথা চিন্তা করেছে তা হলো আল্লাহ রিজিকদাতা। সুতরাং বাদলের বক্তব্যে তাওহিদের প্রতি স্বচ্ছ বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বদরুলের বক্তব্যটিতে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।

তার বক্তব্যে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে শরিক করা হয়েছে। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। শিরক মূলত চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা : আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা, তাঁর গুণাবলিতে শিরক করা, সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। উদ্দীপকে বদরুলের বক্তব্যে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা এবং আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে তাঁর অংশীদার বানানো হয়েছে। তাই বদরুলের ব্যাপারে শিক্ষকের মন্তব্যটি কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ -

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)। এ ছাড়াও সূরা লুকমানে শিরককে চরম জুলুম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং বদরুলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষকের মন্তব্যটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যথার্থ হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

খ নবি-রাসুল প্রেরণের অন্যতম কারণ হলো মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য বা কারণ হলো– মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া, আল্লাহর ইবাদত ও ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া, পরকাল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ইত্যাদি।

গ জনাব 'ক'-এর ধারণাটি কুফরির শামিল।

'কুফর' শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা। আর পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ড দ্বারা বোঝা যায়, সে কুফরিতে লিপ্ত। কারণ মানুষ যতভাবে কুফরি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো হারামকে হালাল মনে করা। যেমন : মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ইসলামে হারাম করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দীপকে জনাব 'ক' এসবকে হালাল বা বৈধ মনে করে ঘুষ গ্রহণ করছে।

সুতরাং বলা যায়, জনাব 'ক' এর ঘুষের টাকা বৈধ মনে করা স্পষ্টই কুফরি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাবিহার কর্মটি স্পষ্টই শিরক।

শিরক অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে।

উদ্দীপকে সাবিহাকে তার স্বামী মন্তব্য করে যা বলেছে তা যথার্থ। কেননা মহান আল্লাহ হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। মহান আল্লাহর গুণ ও ক্ষমতায় আর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। তাই আল্লাহ না চাইলে কোনো পীর বাবার ক্ষমতা নেই কাউকে সন্তান দেওয়ার। আর এ কারণেই মহান আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইতে হবে। তাঁর হাতেই আমাদের ভালোমন্দ, চাওয়া-পাওয়ার সবকিছু রয়েছে। আর এ কথাই উদ্দীপকে সাবিহার স্বামী তার মন্তব্যে বলতে চেয়েছেন।

অতএব বলা যায়, মহান আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক। তাঁর হাতেই মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। তাই কোনো পীর বাবার কাছে না গিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং যা কিছু তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ প্রশ্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো কোনো কিছুই আল্লাহ তায়লার সমতুল্য নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।' অর্থাৎ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

গ জনাব 'খ'-এর কাজটি সূরা আদ-দুহার শিক্ষার পরিপন্থি।

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাজিল হয়। এ সূরায় আল্লাহ মানুষকে কিছু নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'খ' এক ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়ে বরং ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ সূরা আদ-দুহার ১০নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন– وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ অর্থাৎ, এবং (সাহায্য) প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।

এর শিক্ষা হচ্ছে, কেউ যদি ভিক্ষা চায় বা কোনো সাহায্য চায় তাহলে তাকে ধমক দেওয়া যাবে না; বরং সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। অথচ উদ্দীপকে জনাব 'খ' এ শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেছে। সে ভিক্ষুককে ধমক দিয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব 'খ'-এর কাজ সূরা আদ-দুহার শিক্ষার পরিপন্থি।

ঘ সূরা আল-মাউনের শিক্ষার আলোকে বলা যায়, জনাব 'গ'-এর স্ত্রী ভয়াবহ দুর্ভোগের শিকার হবে।

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা এবং এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৭টি। এটি মক্কি সূরা। মহান আল্লাহ এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এসব ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'গ'-এর স্ত্রী তার এক প্রতিবেশীকে একটু লবণ দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে। তার এহেন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা আল-মাউনের ৪নং ও ৭নং আয়াতে যথাক্রমে বলেন, 'দুর্ভোগ (ধ্বংস) সেই সালাত আদায়কারীদের এবং যারা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো বস্তু অন্যকে দেয় না।' যারা গৃহস্থলির প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো কোনো বস্তু দিয়ে সাহায্য করতে চায় না আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত দিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব 'গ'-এর স্ত্রী তার এহেন কাজের দরুন দুনিয়াতে আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা দুর্ভোগের শিকার হবে এবং পরকালেও তিরস্কৃত হবে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের মধ্য হতে পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে।

খ মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এ কারণে ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। সর্বোপরি এর গতিশীলতা প্রমাণিত হয় শরিয়তের চতুর্থ উৎস কিয়াসের মাধ্যমে, যা অনাগত সমস্যা সমাধানের পথকে উন্মুক্ত রেখেছে।

গ মিজান সাহেবের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আল-কুরআনের সূরা আদ-দুহার শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে। কেননা মিজান সাহেব ইসলামের বিধি-বিধান পালনের পাশাপাশি অসহায় ও সাহায্য প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গকে প্রচুর দান-খয়রাত করেন। ইয়াতীম-ভিক্ষুকদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন।' যা সূরা আদ-দুহার ৯ ও ১০নং আয়াতের শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ৯. সুতরাং আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না ১০. এবং প্রার্থী (ভিক্ষুক বা সাহায্যপ্রার্থী)-কে ধমক দেবেন না।

এ দুটি আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে– অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাঁদের ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। উদ্দীপকের মিজান সাহেবও এ কাজটিই করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মিজান সাহেবের কর্মকাণ্ডে সূরা আদ্-দুহার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জিসান সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের ৭নং হাদিস অর্থাৎ পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাদিসটি হলো–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ۔

অর্থাৎ, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিসে রাসুল (স) এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের সম্পর্ক কী এবং একের প্রতি অপরের কর্তব্য কী তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং মুসলমানদের উচিত বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে পরস্পরকে রক্ষা করা। উদ্দীপকে জিসান সাহেব তার এলাকার জারিফকে সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করলে সে তার কাছে আশ্রয় চায়। জিসান সাহেব তাকে আশ্রয় দেন। তখন সন্ত্রাসীরা তাকে ফেরত চাইলে তিনি তাকে তাদের হাতে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি উক্ত হাদিসের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

অতএব, কোনো মুসলমানকে কোনো ধরনের অত্যাচার করা যাবে না এবং সে যতই অপরাধ করুক না কেন তাকে কোনো অবস্থাতেই শত্রুর হাতে সোপর্দ করা যাবে না। নিজ ভাইয়ের বিপদের সময় অপর ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তেমনি এক মুসলমান ভাইও অপর

মুসলমান ভাইয়ের বিপদাপদ দূর করতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। এ মর্মে রাসুল (স) ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।' (মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। আপদে-বিপদে একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَادِ) (বান্দার হক বা অধিকার)। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ উদ্দীপকের জনাব আলম যথাযথভাবে যাকাত আদায় করেননি। তার জমাকৃত টাকার পরিমাণ হলো ১০,০০,০০০ টাকা।

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সাহিবে নিসাবকে বছরান্তে জমাকৃত টাকার ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হয়। আলম সাহেব যেহেতু ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার মালিক তাই তাকে নিম্নোক্ত হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

১০০ টাকায় যাকাত আদায় করতে হবে = ২.৫ টাকা

∴ ১ ,, ,, ,, ,, ,, = $\frac{২.৫}{১০০}$,,

∴ ১০,০০,০০০ ,, ,, ,, = $\frac{২.৫\times ১০০০০০০}{১০০}$,,

অতএব উদ্দীপকের আলম সাহেব ২৫,০০০ টাকা যাকাত আদায় করলে তার যাকাত আদায় হবে। অন্যথা তার যাকাত আদায় হবে না।

ঘ উদ্দীপকে আজমল সাহেব ইসলামের অন্যতম ফরজ ইবাদত সাওম পালন করেছেন। আর এর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। সাওম আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা।

উদ্দীপকের আজমল সাহেব রমযান মাসে রাতের শেষ প্রহরে সাহরি খেয়ে সারাদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাওম পালন করে থাকেন। কেননা এর মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কোনো কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর সাওম (রোযা) ফরজ করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পার।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৮৩)

সুতরাং উপরিউক্ত উদ্দীপক পাঠে বোঝা যায় যে, আজমল সাহেব তাকওয়া অর্জনের লক্ষ্যে রমযানের সাওম পালন করলেও অফিসে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে না, যা প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে। তাই তার উচিত রমযানের সাওমের শিক্ষা তাকওয়াকে নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় তাকে যাকাতের নিসাব বলে।

খ নিয়মিত যাকাত আদায় বলতে বোঝায়, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের বছরান্তে শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা। মাঝে মাঝে বা অনিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করলে হবে না। প্রতি বছর সঠিকভাবে হিসাব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে।

গ উদ্দীপকে নাজিম মোল্লার মনোভাব ইসলামি শরিয়তের আলোকে সঠিক নয়।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। নিয়মিত যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। তাই একে যাকাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। কোন মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাত আদায় করা ফরজ। অস্বীকার করা কুফরি। যাকাতের মাধ্যমে ধনীর সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৬)

উদ্দীপকে নাজিম মোল্লা একজন ধনী লোক। তিনি নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না। তার ধারণা যাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে যাবে। এরূপ মনোভাব ইসলামি শরিয়ত সমর্থন করে না। শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত আদায়ে সম্পদ আরও বাড়ে।

সুতরাং উদ্দীপকে নাজিম মোল্লার ধারণায় কুফরি প্রকাশ পেয়েছে। তার উচিত তওবা করে যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা।

ঘ উদ্দীপকে ইমাম সাহেবের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি হয়। এতে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (স) যাকাতকে ইসলামের

সেতুবন্ধ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন– اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, 'যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।' (বায়হাকি)

যাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে না; বরং তা আল্লাহ তায়ালা আরও বাড়িয়ে দেন। যাকাত আদায়ে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। এই পরিশুদ্ধ সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে বা অনিয়মিতভাবে আদায় করলে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। ইসলামি আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

উদ্দীপকে ইমাম সাহেব বলেন, যাকাত প্রদানে সম্পদ কমে না; বরং বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া যাকাত ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তার এরূপ বক্তব্য শরিয়তের আলোকে সঠিক ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হওয়ার জন্য তকদিরে বিশ্বাস করতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ইমানে মুফাসসালে বিষয়গুলো একত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমানের মৌলিক বিষয় মোট ৭টি। এর মধ্যে তকদিরে বিশ্বাস অন্যতম। ইমানের মৌলিক ৭টি বিষয়ের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। এর কোনো একটির প্রতিও সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকলে ইমানদার হওয়া যাবে না। তাই অন্যান্য বিষয়ের সাথে তকদিরের প্রতিও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

গ উদ্দীপকের রাসেলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহর 'ওয়াদা পালন' গুণটি অনুপস্থিত।

ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালন সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে রাসেল বেশি টাকার আশায় কথা রক্ষা করেনি। অর্থাৎ সে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। কিন্তু উদ্দীপকে রাসেল তার কর্মকাণ্ড দ্বারা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, যা আখলাকে হামিদাহর পরিপন্থি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রাসেলের চরিত্রে আখলাকে হামিদাহর 'ওয়াদা পালন' গুণটি অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ জনাব জাহিদের কর্মকাণ্ড মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত। যার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদিকে বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকে জনাব জাহিদ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানবসেবা করেছেন। আর মানবসেবা দ্বারা মানুষ জীবনে অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারে। যেমন : যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) বলেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

অর্থাৎ, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' (তিরমিযি)। এছাড়া মানবসেবার প্রতিদান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেন, 'কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন।' রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।'

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে মানবসেবার প্রতিদান বা ফলাফল সীমাহীন। মানবসেবার দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর দয়া ও নিয়ামত লাভ করতে পারে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাই হচ্ছে ওয়াদা পালন।

খ নিজেকে মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত-পবিত্র মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। শালীনতা ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি। শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতা, ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদি অনাচারের প্রসার ঘটায়; কিন্তু ব্যক্তি সামাজিকভাবে শালীনতা বজায় রাখলে মানুষের মানসম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাই একটি সুন্দর জীবন গঠনে শালীনতার গুরুত্ব অপরিহার্য।

গ আরমানের কাজে আখলাকে হামিদাহর 'নারীর প্রতি সম্মানবোধ' গুণটি ফুটে উঠেছে।

নারীকে নারী হিসেবে সম্মান করা বা করতে পারা একটি মহৎ গুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরমান ট্রেনে মায়ের বয়সী এক মহিলাকে তার নিজের সিটে বসতে দিয়েছেন। এ কাজের দ্বারা তিনি মূলত একজন নারীকে সম্মান করেছেন। নারীর প্রতি সম্মান দেখানোর বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন : তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া; তাদের সম্পদ, ইজ্জত ও সম্মানের সংরক্ষণ করা; তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ইত্যাদি। একজন নারী সম্মান পেতে পারে কখনো মা বা মায়ের মতো হিসেবে, বোন হিসেবে, খালা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ইত্যাদি। এভাবে নারীকে তার অবস্থান থেকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া আখলাকে হামিদাহর অন্যতম একটি গুণ। আর এ গুণের কারণেই উদ্দীপকে আরমান তার সিটে উক্ত মহিলাকে বসতে দিয়েছেন।

ঘ মনির সাহেবের কর্মকাণ্ডটি মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

মানবসেবা বলতে বোঝায় মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকে মনির সাহেব মনে করেন, মানবসেবা করা রাসুলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ। মনির সাহেবের এ ধারণা যথার্থ। আমাদের প্রিয়নবি (স) মানবসেবায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ছোটো-বড়, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, সকলের খোঁজখবর নিতেন। বিপদগ্রস্ত, অভাবীদের সহায়তা করতেন। তাঁর দয়া, মায়া ও সহানুভূতি থেকে তাঁর চরম শত্রুও বঞ্চিত হতো না। রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবনী পাঠ করলে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায়, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যথাসম্ভব সকল মানুষের সেবায় এগিয়ে আসা।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে রাসুল (স)-এর গঠিত শান্তি সংঘকে হিলফুল ফুযুল বলে।

খ আরবদের সাহিত্যের প্রতি খুব অনুরাগ ছিল। তারা অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করতেন। উকায মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাদের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো সোনালি বর্ণে লিখে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। জাহিলি যুগে তারা কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তাদের কবিতায় উঠে আসত। তাই বলা হয়, কবিতা হলো আরবদের জীবনালেখ্য।

গ চেয়ারম্যানের বক্তব্য মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রতিচ্ছবি।

মহানবি (স) ৬৩২ খ্রি. (দশম হিজরিতে) তাঁর শেষ হজের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আমাদের নিকট বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে লক্ষ স্রোতার সামনে সেদিনকার ভাষণ আজও মানবতা ও নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নির্দেশ ছিল। যথা : ১. হে বিশ্বাসিগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনই তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং ২. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে। তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতো মানুষ। উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের বক্তব্যে এ বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুরাদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভাষণে স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করা ও কাজের লোকদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ করার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাই তা রাসুল (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যপট-২-এ জাবিরের বৈশিষ্ট্য হযরত আলি (রা)-এর জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি হযরত আলি (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (স) তাঁকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি প্রদান করেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আলি (রা) অসাধারণ মেধার অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস ও জ্ঞানসাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উদ্দীপকে জাবিরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসী ভূমিকার জন্য বীরবিক্রম উপাধি পাওয়া এবং সাহিত্যে ভালো দক্ষতার জন্য সাহিত্যের বিশ্বকোষ বলা ইত্যাদি হযরত আলি (রা)-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদর্শ বলতে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য চাল-চলন এবং রীতিনীতিকে বোঝায়।

খ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাছে আইনের চোখে সব মানুষ সমান ছিল।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্তপ্রতীক। তিনি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। একবার মদ্যপানের অপরাধে তার নিজের ছেলে আবু শাহমা অভিযুক্ত হয়েছিল। তখন তিনি অপরাধী ছেলেকে নিজের হাতে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। মোটকথা, হযরত উমর (রা) আইনের চোখে কাউকে ভেদাভেদ করেননি।

গ জনাব সালামের কর্মকান্ডে হযরত আবু বকর (রা)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তার শাসনকে ঐতিহাসিকদের অনেকে সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ মনে করেন। জনাব সালামের কাজে এ আদর্শবান ও অনুসরণীয় শাসকের গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সালাম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমি আপনাদের সেবায় কাজ করব। ভুল হলে মুরব্বিরা তা শোধরিয়ে দেবেন। অর্থাৎ তিনি নিজের শাসন ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। জনাব সালাম মূলত হযরত আবু বকর (রা)-কে অনুসরণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন গণতান্ত্রিক মানসিকতার মূর্তপ্রতীক। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই তার কথায় এ মানসিকতার উত্তম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর

রাসুল (স)-এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তিনি এ কথার মাধ্যমে মূলত নিজের ও রাষ্ট্রের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব সালামের কাজে হযরত আবু বকর (রা)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

ঘ জনাব কালামের কার্যক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

হযরত উসামন (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন। এছাড়া তিনি কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখেন। জনাব কালামের কাজে খলিফার এসব কাজের প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব কালাম এলাকার বটমূলে একটি বিশ্রামাগার, একটি মসজিদ ও একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি কারবালার কাহিনির উপর লেখা পুঁথিমালার একশত কপি প্রিন্ট করে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা) কালামের করা কাজগুলো সরাসরি করেননি বটে তবে তিনি এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮০০০ দিনার ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীর মধ্যে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অনেক অর্থ খরচ করেন। এছাড়া তার সময় পবিত্র কুরআন নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করে এর আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করেন। এ কপিগুলো তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি কুরআন সংকলন করেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চেয়ারম্যানের বন্ধু কালামের কাজ হযরত উসমান (রা)-এর আদর্শকে ধারণ করলেও তার তুলনায় হযরত উসমান (রা) জনস্বার্থে বেশি অবদান রাখেন।

<u>১১নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক আস-সাবউল মুআল্লাকাত হলো প্রাক-ইসলামি আরবে অনুষ্ঠিত উকায মেলায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সেরা সাতটি কবিতা।

খ আলোচ্য উক্তিটি বুহায়রা নামের এক পাদ্রির। মহানবি (স) সম্পর্কে তিনি এ উক্তিটি করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স) ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সাথে সিরিয়া যান। যাত্রাপথে বুহায়রা নামের এক পাদ্রির সাথে তাদের দেখা হয়। এ পাদ্রি মুহাম্মাদ (স)-কে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে শেষ নবির লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। এজন্যই তিনি মহানবি (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'এ বালকই হবেন শেষ নবি'।

গ জনাব জলিলের বক্তব্যে মহামনীষী ইবনে সিনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি অনন্য নাম হলো ইবনে সিনা। তিনি দশ বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। তিনি মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জনাব জলিলের বক্তব্যে এ মহান মনীষীরই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব জলিল মধ্যযুগের এমন একজন কুরআনে হাফিজের কথা বলেন যিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখেন। আর এ অবদানের জন্য তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ করে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। ইবনে সিনার ক্ষেত্রেই এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। কারণ তার রচিত 'আল-কানুন ফিত-তিবব' চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অমর গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। এতে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ রয়েছে। চিকিৎসায় তার অসাধারণ অবদানের জন্য তাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসাপ্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, জলিলের বক্তব্য ইবনে সিনার প্রতিই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাপড় ব্যবসায়ী হলেন ইমাম আবু হানিফা (র)। তাঁর সম্পর্কে জনাব কালামের বক্তব্য যথার্থ।

ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন একজন আল্লাহভীরু পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন। তবে সতেরো বছর বয়স থেকে তিনি জ্ঞান সাধনা করে ইসলামি জ্ঞানের উৎস হাদিস, তাফসির, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

উদ্দীপকে একজন কাপড় ব্যবসায়ীর কথা বলা হয়েছে। যিনি হাদিস, তাফসির ও ফিকহশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে জগতময় খ্যাতি অর্জন করেন। তার সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষক জনাব কালাম বলেন, আল্লাহভীরু এ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তার বক্তব্য যথার্থ, কেননা তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনিই দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকহ বা ইসলামি আইনকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। কারণ খলিফা মনসুর অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন। খলিফার নির্দেশ অমান্য করায় তাকে বন্দি করা হয় এবং কারাগারে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের কাপড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা (র)-কে নির্দেশ করা হয়েছে যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি

১	M	২	K	৩	N	৪	K	৫	L	৬	L	৭	K	৮	M	৯	L	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	L	১৪	N	১৫	K
১৬	M	১৭	N	১৮	M	১৯	L	২০	M	২১	M	২২	N	২৩	L	২৪	K	২৫	M	২৬	L	২৭	K	২৮	L	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিকনির্দেশনাস্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বল।

খ ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এই স্বল্প জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেছেন। সুতরাং মানবজীবনে রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্ধারিত।

গ উদ্দীপকে জনাব আশফাকের ধারণায় খতমে নবুয়তের বিষয়ে অবিশ্বাস প্রতীয়মান হয়।

খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারার সর্বশেষ আগমন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' (সূরা আল-আহযাব : আয়াত- ৪০)

অতএব প্রিয় নবি (স) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। উদ্দীপকে জনাব আশফাকের ধারণার মধ্যে সর্বশেষ নবির প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খতমে নবুয়তের প্রতি জনাব আশফাকের অবিশ্বাস রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শোয়েবের বিশ্বাসটি হলো ইমানের অন্যতম মৌলিক বিষয় আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস।

দুনিয়ার পরে যে চিরস্থায়ী জীবন তাই আখিরাত বা পরকাল। সেখানে কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি কতগুলো পর্যায় রয়েছে। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর অসৎ কাজের জন্য জাহান্নাম। সৎকর্মশীল জীবন গঠনে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনার নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুলত্রুটি শোধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। এভাবে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে। জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। জাহান্নামিদের কাজ যেমন : আল্লাহর আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায়-অনৈতিক কাজ করা ইত্যাদি থেকে মানুষ বিরত থাকে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে।

সুতরাং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস সৎকর্মশীল জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ হাশর হলো মহাসমাবেশ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণিকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। তাই হাশরের নামকরণ যথার্থ হয়েছে।

গ উদ্দীপকে জনাব আনোয়ার ক্লাসে আসমানি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়ালার বাণী। যেসব কিতাব মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে দিকনির্দেশনাস্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। নানা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদি আসমানি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় এর মাধ্যমেই পেয়েছি। পৃথিবীতে মোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন।

উদ্দীপকে শিক্ষক বিখ্যাত ফেরেশতা দ্বারা জিবরাইল (আ) এবং ঐশী বার্তা দ্বারা আসমানি কিতাবসমূহকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং উদ্দীপকের জনাব আনোয়ারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো আসমানি কিতাব।

ঘ উদ্দীপকে ফয়সালের বক্তব্যে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো আল-কুরআন।

আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজনমাফিক সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের দিক থেকে আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এর সমকক্ষ আর কোনো কিতাব নেই। আল-কুরআন হলো পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ অর্থাৎ, 'আমি এই কিতাবে কোনো

কিছুই বাদ দিইনি' (সূরা আল-আনআম : আয়াত-৩৮)। আল-কুরআন সন্দেহমুক্ত কিতাব। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই নির্ভুল বা অকাট্য নয়; কিন্তু আল-কুরআন নির্ভুল এবং এটি সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।' কুরআন হলো পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সারনির্যাস। কুরআান হলো সর্বজননীন কিতাব। এটি কোনো দেশ, কাল, জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর রক্ষক। তাই আল-কুরআন হলো অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। এটি লাওহে মাহফুজ তথা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ফয়সালের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো আল-কুরআন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ মারফু (مَرْفُوْعٌ)শব্দের অর্থ উচ্চ, উন্নত ও মর্যাদাবান। আর ইসলামি পরিভাষায়– যে সকল হাদিসের বর্ণনাসূত্র রাসুলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও কোনো বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

গ উদ্দীপকে তাওহিদের তিলাওয়াতে তাজবিদের জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ তার তিলাওয়াত শুদ্ধ নয়। তাজবিদের জ্ঞান থাকলে তিলাওয়াত শুদ্ধ হতো।

পবিত্র কুরআন শুদ্ধ করে তিলাওয়াতের নিয়ম নীতি শেখা যায় তাজবিদের মাধ্যমে। এছাড়াও এর মাধ্যমে আরবি বর্ণের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানবিনের হুকুম, ইজহার, ইদগাম, ইখফা, কলব, মাদ্দ, ওয়াজিব গুন্নাহ, সাকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা যায়। এর সাহায্যে বিরাম চিহ্ন সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। ফলে পবিত্র কুরআন সহিহ শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, তাওহিদের তিলাওয়াতে তাজবিদের অভাব থাকায় সে অশুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করেছে।

ঘ উদ্দীপকে আকরামের মনোভাব যথার্থ। কেননা শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করার দ্বারা হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করা যায়।

ইসলামি শরিয়ত বলতে ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে বোঝায়। এ কারণে একজন মুসলিমের জন্য শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে ইসলামের পথে জীবন পরিচালনা করা যায় না। তাই ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।' শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করলে ইবাদতের পদ্ধতি জানার পাশাপাশি ইবাদতের মর্যাদাও জানা যায়। এছাড়া পাপাচার (গুনাহ) সম্পর্কে এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের উপর চলার জন্য শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলে।

খ আল-কুরআন সংকলনের দায়িত্ব পালনের জন্য উসমান (রা)-কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধানে তিনি অন্য সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য চারজন সাহাবির একটি বোর্ড গঠন করেন। যারা উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের মূল কপিটির সাথে মিলিয়ে কতকগুলো অনুলিপি তৈরি দ্বারা আল-কুরআনকে বিকৃতি ও গরমিল থেকে রক্ষা করেন। এ মহান কাজটি উসমান (রা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হওয়ায় তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী বলা হয়।

গ জব্বার সাহেবের কর্মকাণ্ডে সূরা আল-মাউনের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে।

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের জব্বার সাহেবের মধ্যে উপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নজরুলের একটি কুড়াল প্রয়োজন হলে সে প্রতিবেশী জব্বার সাহেবের কাছে চাইতে যায়। জব্বার কুড়াল না দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়। তার এ কাজ সূরা আল-মাউনের শিক্ষা ধারণ করে না। কারণ এ সূরা থেকে জানা যায় গৃহস্থালির ছোটোখাটো বস্তু অন্যকে না দেওয়া কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের ত্যাগ করা উচিত। কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যধারীদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। তাই এগুলো পরিত্যাজ্য। কিন্তু জব্বার সাহেব এ বিষয় আমলে না নিয়ে প্রতিবেশীকে নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি কুড়াল দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং বলা যায়, জব্বার সাহেবের কাজে সূরা আল-মাউনের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে কাজলের কাজে সূরা আল-মাউনের একটি শিক্ষা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আর এ সম্পর্কে তার স্ত্রীর মন্তব্যটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ সূরা আল-মাউনে কাফির-মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো ত্যাগ করে বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণের শিক্ষা পাই। এসব শিক্ষার একটি অর্থাৎ নিঃস্ব-দুস্থদের সাহায্য করার বিষয়টি কাজলের কাজে প্রকাশ পেয়েছে।

কাজল রাস্তার পাশে একটি প্রতিবন্ধী শিশুকে কাঁদতে দেখে বুকে তুলে বাড়ি নিয়ে আসলেন। মহান আল্লাহ সূরা মাউনে পরোক্ষভাবে এ ধরনের কাজ করার জন্যই মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। ইয়াতীম, দুঃস্থ, অসহায়দের তাড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। যথাসম্ভব তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া সূরা আল-মাউন থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে উৎসাহ দিতে

হবে। উদ্দীপকের কাজলের স্ত্রীর মন্তব্যে এ শিক্ষা অনুপস্থিত। কারণ সে তার স্বামীর দুস্থকে সাহায্যের বিষয়টিতে উৎসাহ না দিয়ে বরং এসব কাজকে হাস্যকর বলেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কাজল প্রতিবন্ধী শিশুটিকে বাড়ি এনে যথার্থ কাজটিই করেছেন। কিন্তু তার স্ত্রী এটিকে হাস্যকর বলে যে মন্তব্য করেছে সেটি যথার্থ নয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ ইসলামি শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশ। শিক্ষা মানবহৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। এজন্যই বলা হয়েছে, শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক'-এর আলোচনায় সাওমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নর ও নারীর উপর রমযান মাসের এক মাস রোযা রাখা ফরজ। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সাওম-এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি)

রাসুল (স) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে উল্লিখিত ইবাদতটি হলো সাওম।

ঘ উদ্দীপকে শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে জনাব 'ক' যাকাতের কথা বলেছেন।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। যাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ।

উদ্দীপকে জনাব 'ক' তার বক্তব্যের শেষাংশে যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্যের ইঙ্গিত করেছেন। যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য হলো, যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। যাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ। অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ ইসলামে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক (Human Rights) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া' (বুখারি ও মুসলিম)। সুতরাং ইসলামি সমাজব্যবস্থায় হাক্কুল ইবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের জব্বার সাহেব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যাকাত পালন করেছেন।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী কেউ হলে এবং ওই সম্পদ তার নিকট এক বৎসর সঞ্চিত থাকলে তাকে শরিয়ত নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং একটি কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর (সূরা আন-নূর : আয়াত-৫৬)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'আপনি তাদের ধনসম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন' (সূরা আত-তাওবা : আয়াত-১০৩)। যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো যাতে সম্পদ ধনী লোকের কাছে পুঞ্জিভূত না হয় এবং অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টি হয়। ধনী-গরিবের ব্যবধান লাঘব হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭) সুতরাং উদ্দীপকের জব্বার সাহেব তার সম্পদের হিসাব করে যাকাত আদায় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালন করেছেন। তিনি তার এ কাজের জন্য অসীম সাওয়াব লাভ করবেন।

ঘ হজ সম্পাদনে আবির সাহেবের করণীয় হলো সামর্থ্য থাকলে পুনরায় হজ পালন করা।

উদ্দীপকের আবির সাহেব হজ সম্পাদন করার জন্য সৌদি আরব গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এজন্য আরাফাতে অবস্থান না করেই তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। এ অবস্থায় তার হজ সম্পাদন হয়নি। কারণ আরাফায় অবস্থান করা হজের অন্যতম ফরজ কাজ। এটি ব্যতীত হজ সম্পূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে 'দম' প্রদান করলে হজ শুদ্ধ হবে না। তাই তার করণীয় হলো হজের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে পুনরায় হজ পালন করা, যদি পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে হজের শর্তাবলির কোনো একটিও অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার জন্য হজ পুনরায় সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সুতরাং উদ্দীপকের আবির সাহেবের হজে ফরজ বাদ পড়ায় তার হজ হয়নি। তাই সামর্থ্যবান হলে তাকে পুনরায় হজ আদায় করতে হবে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ সম্পদ কিংবা কোনো তথ্য কিংবা অন্যকিছু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে।

খ মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত– এটি মহানবি (স)-এর বাণী। মহানবি (স) এ বাণীর মাধ্যমে মা জাতি তথা নারী জাতিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। ইসলাম নারীকে বিভিন্নভাবে মর্যাদা দিয়েছে। তার মধ্যে 'মা'-কে আরও অধিক সম্মান প্রদর্শন করেছে। এ পৃথিবীতে আল্লাহর হকের পরেই মায়ের হক আদায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মায়ের হক আদায় করা সন্তানের উপর ফরজ। মায়ের হক আদায় না করলে বেহেশত লাভ করা যাবে না। বেহেশত লাভের অন্যতম শর্ত হলো মায়ের হক আদায় করা, যা রাসুল (স)-এর উক্ত বাণীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

গ আদনান সাহেবের আচরণে আখলাকে হামিদাহর 'তাকওয়া' গুণটির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আদনান সাহেব বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের ন্যায় চলাফেরা করেন। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামি চেতনা ও ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। আর পাশ্চাত্য জীবনধারা এর বিপরীত। সেখানে স্যাকুলার তথা পার্থিব সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে না। তাদের বর্তমান জীবনধারার মূল কথা হলো– Eat and Enjoy 'খাও দাও ফুর্তি কর।' তাদের পোশাক-আশাক, অভিবাদন, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। উদ্দীপকে আদনান সাহেব এসব অনুকরণ করেন। তার মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থাকত তাহলে তিনি এভাবে জীবনযাপন করতে পারতেন না। সুতরাং বলা যায় যে, আদনান সাহেবের আচরণে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অনুপস্থিত রয়েছে।

ঘ আঃ রহমানের আচরণে 'মানবসেবা' গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন, তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (স) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তা হলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (স) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।' (বুখারি)

উদ্দীপকে দেখা যায়, আঃ রহমানকে যে বৃদ্ধ কষ্ট দিত, সে অসুস্থ হলে তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এটি মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুল (স)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব সব মানুষের সেবা করা উচিত।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে।

খ ইজমা ইসলামি শরিয়তের তৃতীয় উৎস। মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ইজমা বা ঐকমত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কেননা দৈনন্দিন জীবনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে এর সমাধানে আল-কুরআন খুঁজতে হয়। পরবর্তীতে রাসুল (স)-এর হাদিস খুঁজতে হয়। আল-কুরআন ও হাদিসে সমাধান না পাওয়া গেলে বিশিষ্ট সাহাবি বা জ্ঞানীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান বা ইজমা করতে হয়। আর এ কারণে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ।

গ আজমল সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহর প্রতারণা বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। যেমন : ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, ভেজাল মেশানো, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা ইত্যাদি। এছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন : পরীক্ষায় নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায়, আজমল সাহেব বিক্রির সময় ওজনে কম দেয় এবং সরু চালের সাথে মোটা চালের মিশ্রণ করে; যা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, আজমল সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহর প্রতারণার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ আঃ হান্নান সাহেবের কর্মকাণ্ডে আমানতদারিতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, যা একজন মুমিনের জন্য অতি আবশ্যক। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয়; বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিদ্যমান থাকা জরুরি। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৫৮) আর আমানত রক্ষা করা একজন মুমিনের আবশ্যক গুণ। মহানবি (স) বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। খিয়ানতকারী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ আগ্রহী হয় না। আমানতদারিতার অভাব অর্থাৎ খিয়ানত পার্থিব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। রাসুল (স) বলেছেন, আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।

সুতরাং বলা যায়, আমানতদারিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরাইশ বংশের বনু তায়িম গোত্রে।

খ হযরত উমর (রা) ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করায় মহানবি (স)-এর কাছে থেকে ফারুক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি পান।

হযরত উমর (রা) প্রথম জীবনে প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-কে হত্যার জন্য খোলা তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে তিনি তার বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাইদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যান। তবে বোনের কণ্ঠে সূরা ত্ব-হার তিলাওয়াত শুনে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পারেন। ইসলাম ও কুফরির (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যে কোনটি সঠিক তা অনুধাবন করতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেন। এজন্য মহানবি (স) খুশি হয়ে তাকে ফারুক উপাধি প্রদান করেন।

গ কামরুল সাহেবের বক্তব্যে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হযরত আবু বকর (রা) বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি সার্বক্ষণিক তাঁর এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কুরআন এবং সুন্নাহকে তিনি জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) তিনিই খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক তিনি খিলাফত পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করেন। কামরুল সাহেবের মধ্যে তার এ আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে কামরুল সাহেব এলাকার জনগণকে বলেন, 'আমি যতদিন আল্লাহ ও রাসুল (স)-এর অনুসরণ করব, ততদিন তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে এবং আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দেবে।' হযরত আবু বকর (রা)-ও মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর অনুসরণ করি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে।' তার এ বক্তব্যে আল্লাহ ও রাসুল (স)-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ, গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনপ্রতিনিধি কামরুল সাহেব সর্বকালের অনুকরণীয় শাসক হযরত আবু বকর (রা)-এর বৈশিষ্ট্যকেই লালন করছেন।

ঘ ছামছুল সাহেবের কর্মে হযরত উমর (রা)-এর ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রজাবাৎসল্য গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে ছামছুল সাহেব তার এ মহান আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে ছামছুল সাহেব একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন। তাই নিজ ছেলের অপরাধে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। আবার জনগণের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করতে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়ান। একই বৈশিষ্ট্য হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি ন্যায়বিচারক এবং নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তাই নিজ পুত্র আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন। এছাড়াও একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যান প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। উদ্দীপকে জনপ্রতিনিধি ছামছুল সাহেব তার এসব আদর্শের আংশিক ধারণ করেছেন।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংরক্ষিত ফলক।

খ শানে নুযুল বলতে আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে বোঝায়।

আল-কুরআন মহানবি (স)-এর উপর একসাথে নাজিল হয়নি। বরং নানা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে এটি নাজিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোনো সমস্যার সমাধানে কুরআনের সূরা বা অংশবিশেষ নাজিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুযুল বলে।

গ বেলাল সাহেবের আচরণে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তাই তাকে গণি (ধনী) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর (৬১০ খ্রি.) ইসলাম ও মানবতার সেবায় তিনি অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন। উদ্দীপকে বেলাল সাহেবের কাজে তার এ আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনপ্রতিনিধি জনাব বেলাল আহমাদ একজন উদার ও দয়ালু মানুষ। সম্প্রতি তার এলাকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসলে তিনি তাদের পানির অভাব দূর করার জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে নলকূপ স্থাপন করেন। তাদের মধ্যে খাবার বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাছাড়া মসজিদও নির্মাণ করে দেন। হযরত উসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। হযরত উসমান (রা) মদিনাবাসীর পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮,০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে মদিনার বিখ্যাত 'রুমা' কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ্ (ধর্মীয় কাজে দান) করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীর মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এছাড়াও তিনি ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে (তাবুক, মুতা প্রভৃতি) অর্থ, উট, ঘোড়া প্রভৃতি দান করে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। সুতরাং বলা যায়, বেলাল সাহেবের কাজে হযরত উসমান (রা)-এর মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ মকবুল সাহেবের কর্মকাণ্ড ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের অনুরূপ– মন্তব্যটি যথার্থ।

হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় এবং ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। সাম্য ও মানবতা ছিল তার চরিত্রের উজ্জ্বল দিক। প্রজাবাৎসল্যের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি যেমন কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তেমনি মানবতার জন্য তিনি কষ্ট অনুভব করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। তাই তাদের দুঃখ মোচনে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। উদ্দীপকে মকবুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে তার এ মহান আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্থানীয় চেয়ারম্যান মকবুল সাহেব রোহিঙ্গা শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে রাতের অন্ধকারে ইউনিয়নের তহবিল থেকে আটার বস্তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এমনকি রোহিঙ্গা গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব বেদনায় সাহায্য করার জন্য তাঁর স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যান। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের মহান ধারক ছিলেন হযরত উমর (রা)। একজন প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে তিনি গভীর রাতে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে যেতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তিনি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন প্রসব বেদনায় কাতর বেদুইন নারীকে সাহায্য করার জন্য। এভাবে হযরত উমর (রা) মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। ন্যায় ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাকল্যাণ সাধন করে তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অনুকরণীয় হয়ে আছেন। চেয়ারম্যান মকবুল সাহেবের কাজে তার এসব আদর্শই ফুটে উঠেছে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলে।

খ হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবি (স)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবার সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (স) তাতে খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেন। তাই তাঁকে ফারুক বলা হয়।

গ অধ্যাপকের আলোচনায় প্রথমোক্ত ব্যক্তির গুণে ইমাম বুখারি (র)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

উমাম বুখারি (র) ছয় বছরে কুরআন হিফয করার পর হাদিসশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য দূরদূরান্তে পড়তে গিয়েছেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদিসশাস্ত্রে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ রচনা করেন। তার বইতে হাদিস বাছাইয়ের জন্য অযু, গোসল ও নফল নামাজের সহায়তা নেন। তাঁর গ্রন্থ পৃথিবীতে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাত। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে কোনো রাজা-বাদশাহের দরবারে গমনাগমন করতেন না। অধ্যাপকের আলোচনার প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যেও এ গুণটি লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, অধ্যাপকের আলোচনায় প্রথম ব্যক্তি হলেন ইমাম বুখারি (র)।

ঘ অধ্যাপকের আলোচনার দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)।

ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তীতে মাত্র ১০ জন নিয়ে বোর্ড গঠন করেন। ফিকহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসয়ালার জন্য এ বোর্ড গবেষণা করত এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে গবেষণা করে সমাধান দিত। ফিকহশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দীনি ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ না করাতে খলিফা আল মনসুরের আদেশে তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। উদ্দীপকে দ্বিতীয় জন প্রসঙ্গে আলোচকের মন্তব্যে উপরোক্ত বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, অধ্যাপকের আলোচনায় দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ইমাম আবু হানিফা (র)।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি

১	L	২	M	৩	N	৪	M	৫	L	৬	K	৭	M	৮	K	৯	N	১০	K	১১	L	১২	K	১৩	M	১৪	N	১৫	L
১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	M	২০	K	২১	M	২২	K	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু।

খ সকল নবি-রাসুলগণই ছিলেন উত্তম চরিত্রের আদর্শ নমুনা। আর আমাদের প্রিয়নবি (স) হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম।

রাসুলুল্লাহ (স) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অত্যাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার বদলে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার কথা বলেছেন। মানুষকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজ জীবনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে কলমে মানুষকে নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন– اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ। অর্থাৎ, উত্তম গুণাবলির পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। (বায়হাকি)

গ লিমনের কর্মকাণ্ডে পরকালীন জীবনের হাশরের স্তরটি ফুটে উঠেছে।

হাশর হলো মহাসমাবেশ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণিকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

প্রদত্ত উদ্দীপকের লিমন লিটনকে বললে, দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পর আমাদের আরও একটি জীবন রয়েছে। সেখানে সকলকেই দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। একথা দিয়ে সে মূলত হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশের কথাই বুঝিয়েছে।

হাশরের ময়দান হলো হিসাব-নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। সেদিন আল্লাহ তায়ালাই হবেন একমাত্র বিচারক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ, 'তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক।' (সূরা আল-ফাতিহা : আয়াত-৩)

সেদিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যারা পুণ্যবান তারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। সুতরাং উদ্দীপকের লিমনের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে কিয়ামত ও হাশরের ময়দানের প্রকৃত অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের লিটনের বিশ্বাসে খতমে নবুয়তের প্রতি ইমানের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

খাতুমুন অর্থ– শেষ, সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগণের দায়িত্ব। সুতরাং খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নায়িয়্যিন বা সর্বশেষ নবি।

প্রদত্ত উদ্দীপকের লিটন আল্লাহর উপর বিশ্বাস করলেও খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করে না। তার এ বিশ্বাস স্পষ্ট কুফরি। হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন।

মুহাম্মাদ (স) শেষ নবি, যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এর উপর বিশ্বাস করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।'

(সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৪০)

আমাদের প্রিয়নবি (স) হলেন খাতামুন নায়িয়্যিন। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেনি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবুয়ত দাবি করেছে তারা সবাই ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কেননা মহানবি (স) বলেন– اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ, 'আমিই শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।' (সহিহ মুসলিম)

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' আখিরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে হয়।

গ উদ্দীপকে আরমানের বক্তব্যে শিরকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। শিরকের চারটি ধরন হতে পারে। যথা :

১. আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা।
২. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা।

৩. সৃষ্টিজগৎ পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো।
৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা।

উদ্দীপকে আরমান তার ড্রাইভারকে যা বলেছে, তাতে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগৎ পরিচালনায় অন্য ব্যক্তিকে অংশীদার বানানো হয়েছে।

সুতরাং উদ্দীপকে আরমানের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে রুহানের উক্তিটিতে কুফরের প্রকাশ পেয়েছে।

'কুফর' শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। যেমন : আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করা, হালালকে হারাম মনে করা, হারামকে হালাল মনে করা ইত্যাদি। রুহান হারামকে হালাল মনে করেছে। তাই কুফর হয়েছে। এর পরিণতি ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং আখিরাতে তথা পরকালেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কুফরের ফলে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের লোভে নানারকম অসৎ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। কুফরের ফলে হতাশা বৃদ্ধি পায়। আশা-ভরসা বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কারণে পার্থিব জীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানবসমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কুফরির কারণে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, যা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ। সর্বোপরি পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে অনন্তকালের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

সুতরাং উদ্দীপকে রুহানের উক্তিটিতে কুফরের প্রকাশ ঘটেছে। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি গ্রন্থ।

খ আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর মুসলিম জ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার ফলই হলো কিয়াস। অর্থাৎ যখন উদ্ভূত কোনো সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না এমনকি ইজমাতেও নয়, তখন বিজ্ঞ আলেম কুরআন, হাদিস ও প্রতিষ্ঠিত ইজমার আলোকে গবেষণা করে উক্ত সমস্যার সমাধান দিবেন। আর এজন্য কুরআন, হাদিস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। এ কারণে চিন্তা ও গবেষণা করে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-২)

গ মি. সালেহীনের মনোবল না হারানোর মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের হাদিস ৯ অর্থাৎ 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য হাদিসটিতে রাসুল (স) বলেন, 'মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. সালেহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা নিঃস্ব হয়ে গেলেও মনোবল হারাননি; বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপরিউক্ত হাদিসের উপর পূর্ণ আমল করেছেন। এ হাদিসের শিক্ষা হলো– সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ এসব মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়। দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। মনোবল হারানো যাবে না; বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও অন্যান্য করণীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। আর উদ্দীপকে মি. সালেহীনের মধ্যে 'ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা' সম্পর্কিত এই হাদিসটির শিক্ষাই ফুটে উঠেছে।

ঘ মি. রফিক-এর কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। যার ফলাফলস্বরূপ মহান আল্লাহ তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন।

মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তারা সকলে একই আদর্শে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী। তাই যেকোনো প্রয়োজনে মুসলমানগণ একে অপরকে সাধ্যমতো সাহায্য করবে, উপকার করবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

উদ্দীপকে মি. রফিকের কর্মকাণ্ড দ্বারা পরোপকার প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ পরোপকারী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।' এরূপ পরোপকারীকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, মি. রফিকের পরোপকারের ফলাফলস্বরূপ তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবেন। আল্লাহ তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। আর এসব কথা রাসুল (স) নিজে বলে গিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত উদ্দীপকের রফিকের মতো পরোপকার করা।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য কল্যাণকর দ্রব্য ও বিষয় হালাল করে দিয়েছেন। হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ অন্যায় ও অসৎ চরিত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ সৎগুণসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে। বস্তুত হালাল খাদ্য মানুষের মধ্যে পবিত্রভাব ও আত্মশুদ্ধির উদ্রেক করে। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানবজীবনে হালালের প্রভাব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে আব্দুল আজিজ তার বক্তব্যের মাধ্যমে শরিয়তের তৃতীয় উৎস তথা ইজমার প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদদের (গবেষকগণের) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। মহানবি (স)-এর পরবর্তী সকল যুগেই ইজমা হতে পারে। তবে ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (স)-এর পরবর্তী সময়ে খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি

(স)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন। উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুল আজিজ কিছু কিছু নতুন বিষয়ের সমাধান সম্পর্কে আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধানে পৌঁছার বিষয়ে আলোচনা করেছে। যা মূলত ইজমা।

ঘ উদ্দীপকে আব্দুর রহমানের বক্তব্যে শরিয়তের চতুর্থ উৎস তথা কিয়াসকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবন বা মানবসমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা একমাত্র কিয়াসের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামের সর্বজনীন জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতির জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী কিয়াসের মহান পদ্ধতির ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِى الْأَبْصَارِ অর্থাৎ, 'অতএব, হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-২)। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণার এই পদ্ধতিই হলো কিয়াস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীলতা দিয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব হয়। এভাবে কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম।

<u>৫নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া।

খ সালাত দ্বারা সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়। সালাত আদায়ের জন্য মুসলমানরা মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার মিলিত হয়। এর ফলে একে অপরের খোঁজখবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

গ উদ্দীপকের আদনান সাহেবের কর্মের মাধ্যমে ইবাদতের দ্বিতীয় প্রকার হাক্কুল ইবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আদনান সাহেব ৫০ লক্ষ টাকার যাকাত বাবদ ৬০ হাজার টাকা গরিবদের দান করেন। যাকাত ও দান করা হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। হাক্কুল্লাহ বলতে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে বোঝায়। অর্থাৎ যেসব ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তাই হাক্কুল্লাহ। অন্যদিকে যাকাত ও দান ইবাদতে মালী বা আর্থিক ইবাদত। যেসব ইবাদত ও সম্পাদনে অর্থসম্পদ ব্যয় করতে হয় তাকে ইবাদতে মালী বা আর্থিক ইবাদত বোঝায়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে আদনান সাহেবের কর্ম তথা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার ও হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী উদ্দীপকের আদনান সাহেবের যাকাত আদায় সঠিক হয়নি।

আদনান সাহেবকে ৫০ লক্ষ টাকায় ১,২৫,০০০ টাকা যাকাত দিতে হতো। কারণ শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়। সে হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকার যাকাত হয়–

১০০ টাকায় যাকাত দিতে হয় ২.৫০ টাকা

$\therefore$ ১ " " " " $\frac{২.৫০}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ৫০,০০,০০০ " " " " $\frac{২.৫০ \times ৫০০০০০০}{১০০}$ টাকা

$= ২.৫০ \times ৫০,০০০$ টাকা

$= ১,২৫,০০০$ টাকা।

$\therefore$ নির্ণেয় যাকাত হলো = ১,২৫,০০০ টাকা মাত্র।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে আদনান সাহেবের ৫০ লক্ষ টাকায় যাকাত হয় ১,২৫,০০০ টাকা। অথচ তিনি আদায় করেছেন মাত্র ৬০,০০০ টাকা। এজন্য তার যাকাত আদায় হয়নি; বরং তার উক্ত দান সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় হিসাব করে পুনরায় যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

<u>৬নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ নৈতিক শিক্ষা মুসলমানের জন্য আবশ্যিক বিষয়।

মানুষকে ইমান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবি (স) প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন রাসুল (স) বলেন, 'চরিত্রের বিচারে যে লোকটি উত্তম মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী' (তিরমিযি)। তাই বলা যায়, ইসলামি জীবনব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে ফারাহ-এর উপলব্ধিতে সাওম বা রোযার শিক্ষা ফুটে উঠেছে। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। রোযা পালনকারী ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার সময় সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। যেমন রাসুল (স) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস' (ইবনে খুযায়মা)। এছাড়াও সাওম অসহায় ও দরিদ্রকে দান করতে শিক্ষা দেয়।

সুতরাং উদ্দীপকে ফারাহ-এর ক্ষুধা দূরীকরণের ভাবনায় রোযার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জেরিনের উপলব্ধিতে যাকাতের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতেই আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। তাইতো প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন– اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, 'যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।' (বায়হাকি)

উদ্দীপকে অভাবগ্রস্ত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে জেরিনের ভাবনা বাস্তব। ধনীরা বছরান্তে তাদের যাকাতযোগ্য সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিতভাবে খরচ করলে ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যাকাতের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধনী-গরিবের মধ্যকার পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনা সনদ।

খ 'খিয়ানতকারী মুমিন নয়' উক্তিটি মহানবি (স)-এর বাণীর প্রতিধ্বনি। মহানবি (স) বলেছেন, যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

খিয়ানত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি মুনাফিকের চিহ্ন। একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আমানত রক্ষা করা এবং খিয়ানত না করা। খিয়ানতের মাধ্যমে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। আমানতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই খিয়ানতকারী মুমিন নয়।

গ জামি সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহর তাকওয়া গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি। শরিয়তের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন খবরও জানেন, তাঁর কাছে মন্দকাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে ব্যক্তি কোনোরকম পাপ চিন্তা করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ সে জানে, অন্য সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান, সে কোনো অবস্থাতেই প্রলোভনে পড়বে না এবং নির্জন স্থানেও পাপকর্ম করবে না।

আর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন উদ্দীপকের জামি সাহেব। কেননা তিনি বশির সাহেবের ছেলেকে চাকরি দেওয়ার বিপরীতে একটি উপহার পাওয়ার প্রস্তাব পান; কিন্তু তিনি অদৃশ্য সত্তা আল্লাহর ভয়ে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, জামি সাহেব তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

ঘ 'ক'-এর ভূমিকায় আখলাকে হামিদাহর 'সিদক' বা সত্যবাদিতা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ দশম শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে সামি নামের এক ছাত্রের ব্যাগ থেকে কিছু টাকা হারানো যায়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর ঘটনাটি উপলব্ধি করে অন্য ছাত্রদের বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। 'ক' নামক একজন ছাত্র শ্রেণিকক্ষে যা ঘটেছে তা বিকৃত না করে হুবহু শিক্ষককে বললেন। যা সত্যবাদিতার বহিঃপ্রকাশ।

সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়– اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থাৎ, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ـ لَهُمْ جَنّٰتٌ ـ

অর্থাৎ, 'এ তো সেই দিন, যে দিন, সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১১৯)। মহানবি (স) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে আছে, 'একবার মহানবি (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জান্নাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, 'সত্য কথা বলা।' (মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা হলো নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলে।

খ মানুষের চরিত্র এবং নেক আমলসমূহ ধ্বংস করে দিতে হিংসা প্রধান শত্রুর ভূমিকা পালন করে।

হিংসুক কখনোই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। হিংসার অভ্যাস হিংসুকের মধ্যে গর্ব, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা করার মানসিকতা গড়ে তোলে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া হাদিস মতে, আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলো নষ্ট করে দেয়। তাই হিংসা মুমিনের প্রধান শত্রু।

গ রশিদ সাহেবের আচরণে আমানতের খিয়ানত প্রকাশ পেয়েছে।

খিয়ানত মানবজীবনের একটি গর্হিত বৈশিষ্ট্য। এটি আমানতের বিপরীত দিকটি প্রকাশ করে। আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। অথচ রশিদ সাহেবের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিল বাল্যবন্ধু রশিদের কাছে বেশকিছু নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার রেখে হজে যান। বাড়ি ফিরে সেগুলো ফেরত চাইলে রশিদ সেগুলো ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। তার এই ধরনের কাজ খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ খিয়ানত শব্দের অর্থ হলো আত্মসাৎ করা, ক্ষতিসাধন করা, ভঙ্গ করা। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। খিয়ানত করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। মহানবি (স)-এর হাদিসে এসেছে খিয়ানত করা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শনস্বরূপ। উদ্দীপকে রশিদের আচরণে এ নিদর্শনই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ জনাব সিফাতের স্ত্রীর আচরণে শালীনতার অভাব বা অশ্লীলতা প্রকাশিত হয়েছে। আর এ সম্পর্কে তার শ্বশুরের উপদেশ পুরোপুরি যথার্থ।

অশ্লীলতা হলো শালীনতার বিপরীত। যেসব কাজ শালীনতাবিরোধী সেগুলো হলো অশ্লীলতা। যেমন : গর্ব-অহংকার, ঔদ্ধত্য, কুরুচি, কুসংস্কার ইত্যাদি। সিফাতের স্ত্রীর কাজে এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিফাতের স্ত্রী অমার্জিত পোশাক পরিধান করে শহরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিছু যুবক তার গতিরোধ করে। তার কাজটি শালীনতাবিরোধী হওয়ার কারণেই তার এই পরিণতি হয়েছে। কারণ অশ্লীল কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাবে সমাজে ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এ কারণে ইসলামে লজ্জাশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়। এর ফলে মানুষ পরকালীন সফলতা লাভ করবে। রাসুল (স) বলেছেন, 'অশ্লীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।' (তিরমিযি)

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সিফাতের স্ত্রীর আচরণটি শালীনতাবিরোধী কাজ। আর এ সম্পর্কে তার শ্বশুর সঠিক মন্তব্য করেছেন।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত উসমান (রা)-কে।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মৃত্যুর পর যে চারজন খলিফা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে খিলাফত পরিচালনা করেছেন, তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদুন অর্থ ন্যায়পরায়ণ খলিফা। এ চারজন খলিফা হলেন– হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলি (রা)। তাঁরা সকলেই মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কাছ থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁরা এ শিক্ষাকে ব্যক্তি জীবনে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদুন বা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষক শহীদ সাহেব ইমাম আবু হানিফা (র)-এর জ্ঞান সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবক এবং হানাফি মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে ব্যবসার প্রতি আগ্রহী হলেও কুফার আলেম-উলামার পরামর্শক্রমে পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। সতেরো বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেও তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। উদ্দীপকেও প্রধান শিক্ষক শহীদ তার ছাত্র কুতুব উদ্দীনকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ প্রদানে এসব কথাই বলেন। তিনি আরও বলেন যে, 'শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই।' এক্ষেত্রে তিনি একজন মহান মনীষীর উদাহরণ দিয়েছেন। যার বয়স ছিল ১৭ বছর। আর ইমাম আবু হানিফা (র)-ও ১৭ বছর বয়সে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, প্রধান শিক্ষক ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কথা বলেছেন।

ঘ শিক্ষকের সর্বশেষ বক্তব্যটি একজন আদর্শ-শিক্ষার্থীরূপে গড়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে– কথাটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

একজন আদর্শ শিক্ষার্থী অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো– সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া, শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া ও সর্বদা শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করা।

উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষক শহীদ সাহেব ছাত্রদের সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপদেশ দেন। আর তাদের শিক্ষকের আদর্শ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রধান শিক্ষকের এ উপদেশ মান্য করলে জীবন শৃঙ্খলিত হবে। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। একজন আদর্শ শিক্ষার্থী সব জায়গায় শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে। যেমন : শ্রেণিকক্ষ, নিজ বাড়ি, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি স্থানে শৃঙ্খলা লক্ষ করা যায়। আর একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের আদর্শ অনুসরণ করে চলে। এক্ষেত্রে তাকে ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, তার কথা ও কাজে মিল থাকবে। আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবে। অন্যায়ের ব্যাপারে হতে হবে আপসহীন।

উদ্দীপকে শিক্ষক শহীদ সাহেব তার ছাত্র কুতুব উদ্দীনকে উল্লিখিত উপদেশগুলো প্রদান করে আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। শিক্ষকের উক্ত উপদেশগুলো মেনে চললে যেকোনো শিক্ষার্থী আদর্শ শিক্ষার্থীরূপে গড়ে উঠতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি গবেষণাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খ ইমাম গাযালি (র)-কে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয়।

ইমাম গাযালি (র) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইহইয়াউ উলুমিদ্ দ্বীন' (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন)। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে অভিহিত করা হয়।

গ জনাব আবদুল হালিমের কর্মকাণ্ড খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসায় করে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেন। যার কারণে তাকে গণি (ধনী) বলা হতো। হযরত উসমান (রা) তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে প্রচুর দান করতেন এবং অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন।

তিনি একবার মদিনাবাসীর পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। আর উদ্দীপকে আবদুল হালিমকেও তার এলাকার উন্নয়নে এ কাজগুলোই করতে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, জনাব আবদুল হালিমের কর্মকাণ্ড হযরত উসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ।

ঘ জনাব আশরাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে খলিফা হযরত উমর (রা)-এর আদর্শের মিল রয়েছে।

হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। যুবক বয়সে তিনি নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা ছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্তপ্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু, আপন-পরের মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে এসেছেন। স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানবদরদি হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগে আরবের লোকেরা নবি-রাসুলগণের শিক্ষা ভুলে নানা অসামাজিক ও মানবতাবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে এ যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা মহানবি (স)-এর ক্ষমার এক বিরল দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহানবি (স) ইসলামের প্রচার শুরু করার পর মক্কাবাসী চরম অত্যাচার-নির্যাতন করলে তিনি মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কা বিজয় করে মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি হন। এ সময় তিনি সুযোগ পেয়েও কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং মক্কাবাসীদের তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এ কারণেই মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার আদর্শ।

গ জনাব ইমতিয়াজের কর্মকাণ্ডে ইসলামি ইতিহাসের ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের সাথে মিল রয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুয়তপ্রাপ্তির পর ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মক্কার কাফেরদের বারবার বাধার সম্মুখীন হন। বিরোধিতার একপর্যায়ে কাফেররা মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাই তিনি মদিনায় হিজরতে বাধ্য হন। মদিনায় বিভিন্ন গোত্রে যেমন আউস ও খাযরাজ ইত্যাদির মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সৌহার্দ স্থাপন করেন। নবি (স)-এর আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কার কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করলে রাসুল (স) মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় তিনি মক্কা বিজয় করেন। রাসুল (স) মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করেন, 'আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।'

উদ্দীপকে জনাব ইমতিয়াজের নিজ এলাকা ত্যাগ এবং অন্য এলাকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে আরিফের সংঘ গঠনের উদ্যোগটি ইসলামের ইতিহাসে 'হিলফুল ফুযুল' বা শান্তি সংঘকে নির্দেশ করছে। আর এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

হযরত মুহাম্মাদ (স) হারবুল ফিজারের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হন। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি দূর করতে তিনি যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। উদ্দীপকে আরিফের উদ্যোগের সংঘটি হিলফুল ফুযুলের অনুরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। তাই ইমাম সাহেব এ উদ্যোগকে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘসহ বিভিন্ন শান্তিসংঘ তাই অনেকাংশে হিলফুল ফুযুলের কাছে ঋণী।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আরিফের প্রস্তাবিত সংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মূল্যায়ন যথার্থ হয়েছে।